OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 28
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 214 - 218
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 214 – 218
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

প্রফুল্ল রায়ের নির্বাচিত ছোটগল্প : নারী প্রসঙ্গ

প্রিয়া দে
অতিথি অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
সূর্য সেন মহাবিদ্যালয়, শিলিগুড়ি
Email ID: deyp942@gmail.com

Received Date *30. 03. 2026*
Selection Date *07. 04. 2026*

Keyword
Struggle, Existential crisis, Culture, Deprived women, Subaltern lives.

Abstract
Prafulla Roy was a prolific Bengali fiction writer. He was born in 1934 in East Bengal (now Bangladesh). After partition he moved to Kolkata. His writing career was characterized by a deep empathy for those living on the fringes of society. He wrote several types of short stories, novels and many of them were adapted into films and TV serials. His works, including 'Keya patar Nauko' and 'karntikal' (Shahitya Academy Award 2003), focused on Subaltern lives, refugees and indigenous communities. He was a prominent voice in Bengali literature for over five decades.

Discussion

স্বাধীনতা পরবর্তীকালে যেসকল কথা সাহিত্যিকরা নিরবচ্ছিন্নভাবে গল্প, উপন্যাস লিখে চলছেন এবং লিখন বৈশিষ্ট্যে পাঠকদের কাছে সুপরিচিত - তাঁদের মধ্যে অন্যতম একজন হলেন প্রফুল্ল রায়। তিনি জন্ম গ্রহণ করেন ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায়। স্বাধীনতার পর অর্থাৎ ১৯৪৭ থেকে ১৯৫২ পর্যন্ত সময়পর্বে পূর্ববঙ্গের হিন্দু মধ্যবিত্ত বাঙালিরা যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক বিপন্নতার মধ্যে দিনযাপন করেছিলেন তাঁদেরই একজন ছিলেন তিনি।

দেশভাগের পর পূর্বপুরুষের মাটি থেকে শিকড় ছিঁড়ে লক্ষ লক্ষ ছিন্নমূল মানুষের সঙ্গে তিনি সীমান্তের এপারে কলকাতায় চলে আসেন। তারপর থেকেই শুরু হয় তাঁর টিকে থাকার জন্য দাঁতে দাঁত চেপে লড়াই। তিনি তাঁর লেখনীর মাধ্যমে হয়ে উঠলেন সর্বস্ব খোয়ানো মানুষের প্রতিনিধি। জীবিকার সন্ধানে তিনি বিভিন্ন সংবাদপত্রে কাজ করেছেন। শুধু তাই নয়, তিনি যুক্ত থেকেছেন বিভিন্ন সাহিত্য পত্রিকার সাথেও। দায়িত্বশীল ও প্রতিষ্ঠিত সাংবাদিক হিসেবে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল বিশেষ করে বিহার, উত্তরপ্রদেশের কিছু অংশ, মহারাষ্ট্র, গুজরাট প্রভৃতি নানা অঞ্চল ঘুরেছেন। লেখক তাঁর এই ভবঘুরে স্বভাবের প্রসঙ্গে বলেছেন –

> "আমাদের এই বিশাল দেশ, তার প্রাচীন স্থাপত্য, তার মন্দির মসজিদ গির্জা গুরুদ্বার, সুরম্য ঐতিহাসিক মিনার, কত অজস্র স্মৃতিস্তম্ভ, রাজা বাদশা সন্তদের সমাধিস্থল এবং কালজয়ী পুরাকীর্তি, তার মহিমান্বিত বনস্পতি, লতা-ফুল-গুল্ম, তার বিস্তীর্ণ পাহাড়মালা, নদী-সমুদ্র-জলপ্রপাত এবং সবার উপরে তার বিচিত্র সব মানুষ, অগণিত জনজাতি, লক্ষ লক্ষ মানুষের বিস্ময়কর জীবনযাপন প্রণালী, তাদের দারিদ্র্য, মহত্ত্ব, সারল্য, নানাবিধ সংস্কার, অস্তিত্বের সংগ্রাম, ধর্মবোধ - সব একাকার হয়ে অদ্ভুত নেশার ঘোরে আমাকে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 28
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 214 - 218
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াত। ভারতবর্ষের আনাজ কানাজ ঘুরে এই দেশকে দেখার সুযোগ যে কারণে ঘটেছিল আমার সেই ভবঘুরে স্বভাবের কাছে আমৃত্যু কৃতজ্ঞ থাকব।”[১]

এই দীর্ঘসময়ব্যাপী পরিভ্রমণ এবং সাংবাদিকতার তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ শক্তির প্রত্যক্ষ প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর গল্প, উপন্যাসগুলিতে। বাংলাসাহিত্যে শরৎচন্দ্রের সময়পর্ব পর্যন্ত চরিত্র চিত্রণ প্রধানত হত ব্যক্তিত্বজ্ঞাপক। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে সাহিত্যিকদের কলমে মানুষের শ্রেণি পরিচয় ব্যক্তি পরিচয়ের সঙ্গেই তাৎপর্যময় হয়ে উঠতে লাগলো। এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘চৈতালী ঘূর্ণী’ উপনাসের কৃষক নায়ককে; মানিক বন্দোপাধ্যয়ের ‘পদ্মানদীর মাঝি’ উপন্যাসের মৎসজীবী সম্প্রদায়কে। এই চরিত্রগুলি শ্রেণি ও ব্যক্তিত্বের সামগ্রিক রূপ হয়ে উঠেছে।

প্রফুল্ল রায়ের গল্পে একদিকে যেভাবে ব্যক্তিমানুষ তার যাবতীয় সংকট নিয়ে প্রতিভাত হয়েছে আবার অন্যদিকে শ্রেণিবিভক্ত সমাজের সংঘাতগুলিকে রূপায়িত করেছেন যথার্থভাবে। ব্যক্তি মানুষের নিজস্ব আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন-সাধ, দীনতা- হীনতা এবং মহত্ত্ব - এ সকল ছোট ছোট বৈশিষ্ট্যের স্বাতন্ত্র্যেই তাঁর গল্পগুলো জীবন্ত হয়ে উঠেছে। লেখকের গল্প কাঠামোর বিন্যাসে নানা শ্রেণির চরিত্রের ভিড় থাকলেও তিনি তাঁর সৃষ্ট নারী চরিত্রগুলিকে স্নেহ, মায়া, মমতা দিয়ে গড়ে তুলেছেন। তা সে যে কোনো ধর্মের, যে কোনো বর্ণের বা যে কোনো সম্প্রদায়ের হোক না কেন। তাঁর গল্পের নায়িকারা কেউবা উচ্চশিক্ষিতা, কেউবা বিবাহবিচ্ছিন্না, কেউবা ভূস্বামীদের দ্বারা শোষিতা, নির্যাতিতা, আবার কেউবা বারাঙ্গনা। ‘সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই’ - এই জীবন দর্শনের উপর ভিত্তি করেই তিনি তাঁর গল্পের নায়িকাদের রূপ দান করেছেন।

ভূস্বামী আর ভূমিহীনদের অন্তহীন সংঘাতের জাঁতায় পৃষ্ট এক অসহায় নারীর মানবিকতার মহিমার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ‘বর্ষায় একদিন’ গল্প। গল্পের নাথুনি একজন মধ্য তিরিশের নারী। দু’দিন উপোসের পর নিজের গ্রাম ছেড়ে তিন মাইল মাঠ পেরিয়ে শ্রাবণের ঘনঘোর বর্ষায় চলেছে নানকিপুরা শহরে। সেখানে গিয়ে কাজ জুটিয়ে চাল ডাল ছাতু আটা কিনে ঘরে ফিরে আসবে। কেননা তার আশায় বসে রয়েছে অসুস্থ স্বামী আর দুটি ছেলে মেয়ে। সমস্ত পরিবারের অন্নদাতা এই নারী। পথে দেখা হয় তারই মতো একটি লোকের সঙ্গে। দু’জনেই রিক্ত। তবু নাথুনি বিশ্বাস করতে পারে না লোকটাকে। নির্জন রাস্তায় মরদকে বিশ্বাস কী? সেসময় পথে দেখা হয় একটি জীর্ণ মোটরগাড়ি ও তার চালকের সঙ্গে। যে চেচক আক্রান্ত দুই বুড়ো বুড়িকে গ্রাম থেকে হাসপাতালে পৌঁছে দিতে চলেছে। কিন্তু ‘কাচ্চি’ রাস্তার কাদামাটিতে ফেঁসে গেছে চাকা। গাড়ি চালকের পক্ষে সম্ভব নয় এই কাদামাটির রাস্তায় একা গাড়িকে পার করা। তাই সে সাহায্য চায় নাথুনি ও লাখুয়ার কাছে। দু’দিনের উপবাসের শরীরেও নাথনি কিন্তু সাহায্য করতে পিছুপা হয় না। সে লাখুয়ার দিকে তাকিয়ে বলে –

> “কী আর করবে? দেখি মানুষ দুটোকে যদি বাঁচানো যায়।”[২]

লেখক তাঁর বর্ণনায় এমন একনারীকে তুলে ধরেছেন যে নিজের ক্ষুধা নিবৃত্তির থেকে অন্যের প্রাণ বাঁচানোকেই প্রাধান্য দিয়েছে। আর নিজেকে সান্ত্বনা দেয় এই বলে যে –

> “না হয় আর একটা দিন ভুখা থাকব। তবু তো দুটো বুড়হা বুড়হীকে বাঁচিয়ে নিয়ে আসতে পেরেছি।”[৩]

নাথুনির মতো নারীরা কিন্তু নিজের অভুক্ত অবস্থায়ের মধ্যেও অন্যকে সাহায্য করার নীতিবোধ থেকে বিচ্যুত হয়নি।

‘সাতঘরিয়া’ গল্পে দোসাদ জাতের এক মহিলা চাঁপিয়ার বিয়ে হতে যাচ্ছে সাত বারের জন্য। এর আগে সে ছ'বার বিয়ে করেছিল - কোনো বিয়েই প্রেমের নয়, শুধুমাত্র খাওয়া পড়ার দায়ে। প্রথম স্বামী মুঙ্গিলাল ছিল রাজপুত মালিকের কামিয়া। সে মরে গেলে মালিকের মুনিশ রাখনি রাখতে চেয়েছিল চাঁপিয়াকে। অচ্ছুৎ ভূমিদাসের ঘরের যুবতী মেয়েদের মালিক এবং তাদের লোকেরা চিরদিন ভোগদখল করে এসেছে। আবহমানকাল ধরে এই অঞ্চলে চালু এই প্রথা। যার বিরুদ্ধে কেউ কখনো মাথা তুলে দাঁড়ায়নি। কিন্তু চাঁপিয়া অন্য ধাতের তেজী মেয়ে। তাই সে মানেনি। এরপর দ্বিতীয় বারের জন্য চুমৌনা হয় রিক্সাচালক চৌপটলালের সঙ্গে। শর্ত একটিই - নিজের খাওয়া পড়া নিজেকেই জোটাতে হবে। খড়ায় চাষ

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 28
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 214 - 218
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

বন্ধ হলে কর্মহীন হয়ে পড়ে চাঁপিয়া। অতএব বিয়েও ভেঙে যায়। এমনি করে আরো চারবার বিয়ে হয়। সপ্তমবারের পাত্র নাটোয়া তাকে বিয়ে করতে রাজি হয় - যদি ক্ষেতের মালিক তাকে পছন্দ করে। কিন্তু তখন চাঁপিয়ার বয়স চল্লিশ, দেহ শীর্ণ। মালিকের পছন্দ হয় না তাই বিয়েও ভেঙে যায়। নিরাশ্রয় এবং ভূমিহীন মানুষের বিবাহের শর্ত আমাদের সামনে এই শ্রেণীর রিক্ততার ছবি তুলে ধরে।

প্রফুল্ল রায় তাঁর গল্পের মাধ্যমে এমন এক সমাজকে তুলে ধরেছেন যেখানে বিবাহ মানে নিজের দায়িত্ব নিজের - এই শর্তে। চাঁপিয়ার মত দোসাদ জাতের নারীও এই শর্তে এগিয়ে চলে। কিন্তু সপ্তমবারের বিবাহ তাকে শর্তহীন দাম্পত্য জীবন গড়ে দেয়।

মধ্যবিত্ত চরিত্রগুলির রূপায়নের ক্ষেত্রে লেখক মূল্যবোধকে প্রাধান্য দিয়েছেন। একারণেই তাঁর গল্পে নৈতিকতার জয় হয়েছে। এই নৈতিকতা কিন্তু পুরনো রক্ষণশীল মনোভাব নয়। বর্তমানের মানুষের মূল্যবোধের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই সেই নীতিবোধেরও রূপান্তর ঘটেছে। আধুনিক জীবনে বিবাহ বিচ্ছেদের স্বাভাবিকতা স্বীকার করে নিয়েছেন লেখক। বিবাহ-বিছিন্না নারী ও পুরুষ পুনরায় ভালবাসবে এবং বিবাহ করবে এক্ষেত্রে লেখক কোনোরূপ নীতিবাদী বিধিনিষেধ আরোপ করেননি কিন্তু বিবাহ বিচ্ছেদের চাপ যে সর্বাধিক নিষ্ঠুর হয়ে বাজে সন্তানের ওপর এই সত্যটিকে তিনি তুলে ধরেছেন। সামান্য একটু বোঝাপড়ার মধ্য দিয়ে বিবাহবিচ্ছেদ যে অনেক ক্ষেত্রে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব তার দৃষ্টান্ত 'মলির জন্য' গল্প। লেখক তাঁর গল্পে তেমনি এক বিবাহ বিচ্ছিন্না নারীর হৃদয়কে তুলে ধরেছেন। ললিতা নিজের আত্মসম্মানবোধ রক্ষার্থে সন্তানকে নিয়ে স্বামীর সংসার ত্যাগ করে এবং নিজেকে স্বাবলম্বী করে তোলে। আবার গল্পের শেষে দেখি সমস্ত অভিমান, অহংকার ভুলে স্বামীর সাথে পুনরায় সংসার বন্ধনে জড়িয়ে পড়তে চায়। গল্পকার আসলে একটি মাতৃহৃদয়কে তুলে ধরতে চেয়েছেন, যে সন্তানের সুখের জন্য সব করতে পারে।

'জন্মদাত্রী' গল্পে ধনী সন্তান রাহুল ভালোবেসেছে বিবাহ বিচ্ছিন্না পারমিতাকে। সে ভালোবাসা কৃত্রিম নয়। রাহুল ভালোবেসে পারমিতার শিশুকন্যাকে গ্রহণ করতেও প্রস্তুত। কিন্তু রাহুলের বিপুল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মা পারমিতাকে মেনে নিলেও তার মেয়েকে বাড়িতে গ্রহণ করবে না। অসহায় পারমিতা অনেক কষ্ট করে মেয়েকে কাছে পেয়েছে। তাই তাকে ছেড়ে থাকার কথা ভাবতে পারে না। সে বুঝতে পারে রাহুল ভীরু, দুর্বল, দ্বিধান্বিত। সারাজীবন ভাবলেও রুনির সম্বন্ধে সে সিদ্ধান্ত নিতে আসতে পারবে না। তাই তো পারমিতা তার ও নিজের মেয়ের দায়িত্ব একাই বহন করবে স্থির করে এবং রাহুলকে চিঠিতে জানিয়ে দেয় –

> "তার এবং রুমির সম্বন্ধে আর ভাবার প্রয়োজন নেই রাহুলের।"[৪]

এই দৃঢ় সাহসী পদক্ষেপই পারমিতাকে উজ্জ্বল করে তুলেছে।

বর্তমান সমাজের এক অন্যতম বাস্তবতা বিবাহবিচ্ছেদ। 'ডোনার জন্য' গল্পে বিবাহ বিচ্ছিন্না জয়ন্তী চেষ্টা করেও মেয়েকে নিজের কাছে রাখার অধিকার পায়নি। বংশের মেয়েকে নিজেদের অধিকারের রাখার অভিলাষে আদালতে গিয়ে জয়ন্তীকে চরিত্রহীনা বলে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে দ্বিধা করেনি তার শিক্ষিতা ব্যক্তিত্বময়ী শাশুড়ি। শুধুমাত্র সপ্তাহে একদিন তাও আবার এক ঘন্টার জন্য মেয়েকে দেখে আসতে পারে। পাঁচ বছর ধরে এই ছিল রুটিন জয়ন্তীর। এরই মাঝে ডোনার বাবা দ্বিতীয় বিবাহ করে এবং নিজের সন্তানের প্রতি উদাসীন হয়ে পড়ে। ডোনাকে যত্নের জন্য তার শাশুড়ি আবার জয়ন্তীকে অনুরোধ করে এবং নিজের কাছে নিয়ে যেতে বলে। একজন পিতা তার সন্তানকে যত সহজে অবহেলা করতে পারে একজন মা ঠিক ততটাই সুন্দরভাবে আগলে রাখতে জানে।

প্রফুল্ল রায়ের গল্পের ভুবনে নারীরা বিভিন্ন ভূমিকায় উঠে এসেছে। তাঁর বেশ কিছু গল্পে বারবনিতারা প্রধান ভূমিকা নিয়েছে। তারাও যে রক্ত মাংসে গড়া মানুষ, তাদের মধ্যেও যে মনুষত্ব রয়েছে, রয়েছে সংসারী হওয়ার সুপ্ত বাসনা - এগুলিকে তিনি নানা ভাবে ব্যক্ত করেছেন তাঁর গল্পে। 'মন্দ মেয়ের উপাখ্যান' গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন –

> "পাঁকে মুখ গুজে থাকলেও সেই মুহূর্তগুলিতে মনে হয় এরা এক একজন মহিমান্বিত নারী। শ্রদ্ধায় বিস্ময়ে তখন মন আপ্লুত হয়ে যায়।"[৫]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 28
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 214 - 218
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

তাঁর 'শেষ যাত্রা' গল্পটি বারাঙ্গনা নারীদের এক প্রথা ভাঙার গল্প। শহর থেকে অনেকটা দূরে ওচা মেয়ে মানুষদের যে সৃষ্টি ছাড়া কলোনি সেখানে পৃথিবীর ছাব্বিশটা জঘন্য মেয়ে মানুষ থাকে। এই নরকের খাসতালুকে সভ্য সমাজ পা বাড়ায় না। কোনো ডাক্তার এদিকে আসেও না এবং এখানকার মেয়েরা তাদের কাছে গেলেও সকলে কুকুরের মত তাড়িয়ে দেয়। কিন্তু ভুবন চক্রবর্তী ডাক্তার হলেও একটু আলাদা ধরনের। তিনি সহৃদয়বান, বেশ্যা বলে না দেখে মানুষ ও রোগী বলে দেখেন এই মেয়েদের। তাই ওই পাড়ার মেয়েরা সকলেই ভুবন চক্রবর্তীকে 'বাবামশায়' বলে ভক্তি ও শ্রদ্ধা উজাড় করে দেয়। কিন্তু এর ফলস্বরূপ ভুবনের থেকে সভ্য সমাজ মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তার বাড়ির লোকেরাও তার সাথে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয়। একদিন হঠাৎই ভুবন ডাক্তার অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং তার সেবা করতে ওই ওচা ছাব্বিশটি মেয়ে মানুষ ছুটে আসে নিজের ব্যবসা রোজগার বন্ধ করে। নিজেদের জমানো কষ্টের টাকা খরচ করে কেষ্টভামিনী ও অন্যান্যরা ডাক্তার দেখালেও ভুবন চক্রবর্তী আর বেঁচে ফেরে না। ডাক্তারের মৃত্যুর সংবাদ তার পরিবারের ভাইদের যখন বলতে যায় তখন তারা বলে –

> "বেশ্যার নারীটি টিপে এতকাল বেঁচে ছিল তার সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই।"[৬]

তখন এই সাতাশটি দেহজীবিনী মেয়ে খই ছড়িয়ে, হরিধ্বনি দিয়ে, খাট কাঁধে নিয়ে পৌঁছায় শ্মশানে। বামুনের মুখে আগুন ছোঁয়াতেও দ্বিধা করে না তারা। কন্যার কর্তব্য পালন করে এই ভেবে যে - ভুবন চক্রবর্তী তাদের বাবামশাই। জন্মটাই নেহাত দেয়নি, নইলে পিতার যাবতীয় কর্তব্যই পালন করে গেছে। মৃত্যুর পর মুখাগ্নি ছাড়া তার সৎকার হবে তা ভাবাই যায় না। এরপর সকলে মিলে শ্রাদ্ধ করে যা এই অঞ্চলে আগে কেউ কখনো দেখেনি। সমাজ বরাবরই মেয়েদের শৃঙ্খল পরিয়ে পিঞ্জরে আবদ্ধ রাখতে চেয়েছে, নানা বিধি নিষেধের বেড়াজালে আটকে রাখতে চেয়েছে। কিন্তু কেষ্টভাবিনী ও তার সঙ্গীরা সবকিছুকে তুচ্ছ করে সমাজে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

'নরক' তেমনই গল্প। নরক বলতে এখানে পতিতালয়কে বোঝানো হয়েছে। তথাকথিত ভদ্রলোকেরা যেখানে দিনের আলোয় যেতে ঘৃণা করে, তারাই আবার রাতের অন্ধকারে সেখানে ভিড় করে। গল্পে নীতিবোধ, দায়িত্বশীলতা, ভালোবাসায়, নরকও স্বর্গ হয়ে উঠেছে। রেন্ডিটোলার সাগিয়া বছরে সাত - আটবার জনকপুর থেকে নৌকপুরে যাতায়াত করে। কেননা কাঠের কারবারি জগমোহন তাকে মাঝে মাঝেই ডেকে পাঠায়। নদী পার হতে গিয়ে প্রবল বিপর্যয়ে তাদের নৌকা উল্টে যায়। এ অবস্থায় সাগিয়া নিজের জীবন বিপন্ন করে একজন অচৈতন্য ব্যক্তিকে ডাঙায় তুলে নিয়ে বাঁচায়। নিজের কষ্টের মজুরি থেকে দশ টাকা খরচ করে তাকে তাদের টোলায় নিয়ে আসে, তার সেবা করে নতুন জীবন দান করে। ডাক্তারের মাধ্যম সাগিয়া জানতে পারে নিমজ্জিত ব্যক্তিটির নাম শিবশঙ্কর শাস্ত্রী। এলাকার একজন সৎ, ধার্মিক, চরিত্রবান, মহৎ মানুষ। এরূপ পরিচয় সাগিয়াদের মধ্যে সংকোচবোধ তৈরি করে। তাদের ছোঁয়া খেলে শাস্ত্রী মহাশয়ের জাত, ধর্ম চলে যাবে। ডাক্তারবাবু বলে –

> "বেশ্যার ছোঁয়া অন্ন তাঁর পবিত্র শরীরে ঢুকলে মৃতুর পর তাঁর যে নরকবাস হবে তা অনন্ত। সে পাপের আর প্রায়শ্চিত্ত নেই।"[৭]

কিন্তু এখানে শাস্ত্রী মহাশয় তাদের সেবা গ্রহণ করে। তারপর স্বর্গ নরকের সীমারেখা ঘুচিয়ে দিয়ে সেখানকার মেয়েদের আশীর্বাদ করে পথে বেড়িয়ে পড়েন দিনের আলোয়। লেখক এখানে ঘুণধরা সমাজের প্রতি চাবুক মেরে দেখিয়েছেন - সাগিয়া বেশ্যা হতে পারে, কিন্তু তার ভেতরের স্নেহ, মমতাকে হারিয়ে যেতে দেয়নি। যা তার মানবিক হৃদয়কে তুলে ধরেছে।

প্রফুল্ল রায়ের 'ভারতবর্ষ' গল্পটা একটু ভিন্ন ধরনের। বোম্বেতে পরপর বোমা বিস্ফোরণ হয়ে গেছে। তার সঙ্গে শুরু হয়েছিল দাঙ্গা। সে বিস্ফোরণে সুমিত্রা তার স্বামীকে হারিয়েছে। সারা শহর জুড়ে যে দাঙ্গা চলছে সেখান থেকে বাঁচতে এক বৃদ্ধ মুসলমান ও তার পুত্রবধূ সুমিত্রাদের বাড়িতে ঢুকে পড়ে। যে বিস্ফোরণে সুমিত্রা তার স্বামী হারিয়েছে সেই বিস্ফোরণকারী সম্প্রদায়ের অন্তর্গত দু'জন মানুষ আজ তার বাড়িতে এসেছে আশ্রয়ের খোঁজে। সুমিত্রা নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 28
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 214 - 218
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

বংশের মেয়ে, বিয়ে হয়েছে গোঁড়া ব্রাহ্মণ পরিবারে। কিন্তু এত দিনের সব সংস্কার ঘুচে যায় আমিনার মতো এক অসহায় নারীকে দেখে। সমস্ত বিপদ থেকে বাঁচিয়ে হাসপাতালে নিয়ে যায়। দাঙ্গা, সংঘাত এসবের থেকেও একটি মাতৃহৃদয় যে কতটা স্নেহপ্রবণ ও ক্ষমাশীল হতে পারে সেটাই গল্পকার তুলে ধরেছেন।

'শেষ দৃশ্য' গল্পটি এক উচ্চশিক্ষিতা রমনীর গল্প। মনোবীণা ইতিহাসের অধ্যাপিকা, ডক্টরেট করেছেন অক্সফোর্ডে। দু'বছর হল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রিটায়ার করে ব্রিটিশ আমাদের বাংলার কৃষকদের উপর একটা বই লিখেছেন। তার খ্যাতি দেশের সীমা ছাড়িয়ে বিদেশেও ছড়িয়ে পড়েছে। দ্বিতীয় স্বামী ও সন্তানকে নিয়ে তার সুখের সংসার। কিন্তু বহু বছর পর যখন তার অসুস্থ শয্যাশায়ী প্রথম স্বামীর চিঠি আসে তখন সে তার অহংকার ত্যাগ করে তাকে দেখতে যায় এবং শ্রদ্ধা পূর্ণ আচরণ পোষণ করে। আর তাই মনোবীনার মতো নারী মানবিকতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।

প্রফুল্ল রায়ের গল্পের প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায় - "মানুষের জীবন তো আসলে একটা নদীর মতো, স্রোত থাকে, বাঁক থাকে, আবার কোথাও কোথাও অগভীর হয়।" তাঁর গল্পের নারীরাও ঠিক নদীর মতো। তাদের চাওয়া পাওয়া, অস্তিত্বের সংকট, সংগ্রাম - বিভিন্ন রূপে ধরা পড়েছে লেখকের কলমে। তাঁর প্রত্যেকটি গল্প জীবনের নানা দিককে নির্দেশ করে। পাঠকের কাছে যার আবেদন চিরন্তন, শাশ্বত। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন—

> "এসব রচনা তাই বলে একটা নির্দিষ্ট দলিল হয়ে থাকেনি বরং হয়ে উঠেছে চিরকালের দুঃখ-সুখমথিত মানব জীবনের আত্মপ্রতিষ্ঠার জীবন্ত কথাচিত্র।"[১০]

একারণেই তাঁর সৃষ্ট প্রত্যেকটি নারী তাদের আপন মহিমায় উজ্জ্বল। এখানেই লেখকের স্বতন্ত্রতা।

Reference:

১. রায়, প্রফুল্ল, সেরা ৫০টি গল্প (গল্প প্রসঙ্গে অংশ), দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, ১ জানুয়ারি, ২০২৩, ভূমিকা।
২. রায়, প্রফুল্ল, সেরা ৫০টি গল্প, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, ১ জানুয়ারি, ২০২৩ পৃ. ৪৩৮
৩. তদেব, পৃ. ৪৪১
৪. তদেব, পৃ. ৩৮৬
৫. রায়, প্রফুল্ল, মন্দ মেয়ের উপাখ্যান, (ভূমিকা অংশ), ক্যালকাটা পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৩৫৭
৬. রায়, প্রফুল্ল, সেরা ৫০টি গল্প, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, ১ জানুয়ারি, ২০২৩ পৃ. ৭৭
৭. রায়, প্রফুল্ল, শ্রেষ্ঠ গল্প, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, দশম সংস্করণ, নভেম্বর ২০১৬, পৃ. ২৪০
৮. তদেব, পৃ. ৩১৮
৯. তদেব, পৃ. ৩১৯
১০. বসু, বিষ্ণু (সম্পাদিত), প্রফুল্ল রায়ের রচনা সমগ্র (দ্বিতীয় খণ্ড), দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, ১ জানুয়ারি ২০২১, ভূমিকা।